بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ মার্চ ২০১৯ মোতাবেক ১৫ আমান ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মধ্যে প্রথমজনের নাম হল, হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.)। তিনি বনু জু'মাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি উসমান বিন মাযঊন (রা.)'র পুত্র ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল, হযরত খওলাহ্ বিনতে হাকীম। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) তার পিতা ও চাচা হযরত কুদামাহ্ (রা.)'র সাথে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরতের পর হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) এবং হযরত হারেসাহ্ বিন সুরাকাহ্ আনসারীর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরন্দাজ সাহাবীদের মাঝে তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নেন। **(উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), {আল্ ইসাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০, সায়েব বিন উসমান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

বুয়াতের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।, যা বুয়াতের যুদ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে, এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিনগুলোতে অথবা রবিউস সানীর শুরুর দিকে মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরাইশদের সম্পর্কে কোন সংবাদ আসে। তখন তিনি (সা.) মুহাজিরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে স্বয়ং মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং তাঁর অবর্তমানে সায়েব বিন উসমান মাযঊন (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরাইশদের কোন হদিস না পেয়ে তিনি (সা.) বুয়াত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৩২৯ দ্রষ্টব্য)**

বুয়াত মদীনা থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত জুহায়নাহ্ গোত্রের একটি পাহাড়ের নাম। **(সুবুলুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫, বাব ফি গাযওয়াতু বুয়াত, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এতে তিনি (রা.) একটি তিরের আঘাতে আহত হন এবং পরবর্তীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছরের কিছু বেশি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭, আস্ সায়েব বিন উসমান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে তার নাম হল, হযরত যামরাহ্ বিন আমর জুহানী (রা.)। হযরত যামরা (রা.)'র পিতার নাম ছিল, আমর বিন আদী, তবে কেউ কেউ তার পিতার নাম বিশরও উল্লেখ করে থাকেন। তিনি বনু তারীফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। আবার কারো কারো মতে, তিনি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র গোত্র বনু সায়েদাহ্'র মিত্র

ছিলেন। মিত্র অর্থাৎ তাদের মাঝে একটি পারস্পরিক একটি চুক্তি ছিল যে, যখনই কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিবে, একে অপরের সাহায্য করবে। আল্লামা ইবনে আসীর উসদুল গাবাহ্‌তে লিখেন, (এই দুই উক্তির মধ্যে) এটি কোন মতবিরোধ নয়, কেননা বনু তারীফ বনু সায়েদাহ্'রই একটি শাখা। হযরত যামরাহ্ (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। **{উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১, যামরাহ্ বিন আমর আল্ জুহানী (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ করা হবে তার নাম হল, হযরত সা'দ বিন সোহেল (রা.)। হযরত সা'দ আনসারী (সাহাবী) ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম সাঈদ বিন সোহেল (রা.)ও বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার একটি কন্যা ছিল, যার নাম ছিল হুযায়লা। **{উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯, সা'দ বিন সোহেল (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, লি-ইবনে সা'দ (রা.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫, সাঈদ বিন সোহেল (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

তার সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানা যায়।

এরপর বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছি। হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তার নাম সাঈদও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি 'ক্বারী' উপাধীতে সুপরিচিত ছিলেন। আর ডাকনাম ছিল, আবু যায়েদ। হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) সেই চারজন সাহাবীর অন্যতম যারা আনসারদের মধ্য থেকে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন সংকলন করেছিলেন। তার পুত্র উমায়ের বিন সা'দ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। একটি বর্ণনানুসারে হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে কুবায় নামাযের ইমামতি করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালেও তিনি এই ইমামের দায়িত্বে বহাল ছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) ষোলতম হিজরীতে কাদেসিয়াহ্‌র যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৬৪ বছর।

আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জিসর এর যুদ্ধ যা ত্রয়োদশ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল, এতে মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন, পিছু হটে গিয়েছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, সিরিয়ায় যুদ্ধ করার আগ্রহ আছে কি? সেখানে মুসলমানদের ভয়াবহ রক্তপাত ঘটানো হয়েছে, মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, যদি তোমার আগ্রহ থাকে তাহলে সেখানে চলে যাও। রক্তপাত ঘটানোর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এতে শত্রু অনেক ধৃষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, এভাবে আপনি আপনার মাঝে পরাজয়ের যে গ্লানি রয়েছে, তা দূর করতে সক্ষম হবেন। কেননা জিসরের যুদ্ধ থেকে পিছু হটার কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, যদি পরাজয়ের এই গ্লানি দূর করতে চান তাহলে সিরিয়াতেও যুদ্ধ হচ্ছে (সেখানে যেতে পারেন)। হযরত সা'দ (রা.) নিবেদন করেন, না আমি সেই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও যাব না যেখান থেকে আমি পালিয়েছিলাম বা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আর সেসব শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যেই বের হবো যারা আমার সাথে যা করার তা করেছে। অর্থাৎ তারা যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিল। অতএব হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) কাদেসিয়ায় যান এবং সেখানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আব্দুর রহমান বিন

আবু লায়লা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবায়েদ (রা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, আগামীকাল আমরা শত্রুর মুখোমুখি হব আর আগামীকাল আমরা শাহাদত বরণ করব, অতএব তোমরা আমাদের দেহের রক্ত ধৌত করবে না আর আমাদের শরীরে যে কাপড় থাকবে সেই কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাফনও পরাবে না। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, লি-ইবনে সা'দ (রা.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, সা'দ বিন উবায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫, সা'দ বিন উবায়েদ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইসাবাতু ফী তাম্য়ীযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

জিসরের যুদ্ধের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পূর্বের একটি খুতবাতেও আমি তুলে ধরেছিলাম, এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলে দিচ্ছি। যেমনটি আমি বলেছি, ত্রয়োদশ হিজরীতে ফুরাত নদীর অববাহিকায় মুসলমান ও ইরানীদের মাঝে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, হযরত আবু উবায়েদ সাকফী (রা.)। আর ইরানীদের পক্ষে সেনাপতি ছিল বাহমান জাদওয়াই। ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার আর অপরদিকে ইরানীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার আরও ছিল তিনশ' হাতি। মাঝখানে ফুরাত নদী প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে উভয় পক্ষ কিছু সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ফুরাত নদীর ওপর **জিসর** বা একটি পুল নির্মাণ করা হয়। আর এই পুলের কারণেই একে জিসরের যুদ্ধ বলা হয়। পুল নির্মিত হওয়ার পর বাহমান জাদওয়াই হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-কে সংবাদ পাঠায়, তোমরা নদী পার করে আমাদের দিকে আসবে না-কি আমাদের অতিক্রম করার অনুমতি দিবে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.)'র মতামত ছিল মুসলমান বাহিনী নদী অতিক্রম করে বিরোধী দলের সাথে যুদ্ধ করবে। যদিও সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের একজন হযরত সালীত এই মতামতের বিরোধী ছিলেন কিন্তু হযরত আবু উবায়েদ (রা.) ফুরাত নদী অতিক্রম করে পারস্য বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। কিছুক্ষণ এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাহমান জাদওয়াই যখন তার সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে, অর্থাৎ ইরানী বাহিনীকে পশ্চাদপদ হতে দেখে, তখন সে হস্তিবাহিনীকে সম্মুখে আনার নির্দেশ দেয়। হস্তিবাহিনী এগিয়ে এলে মুসলমানদের সৈন্যসারি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মুসলমান বাহিনী দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। (তখন) হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মুসলমানদেরকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! হাতিদের ওপর আক্রমণ কর আর তাদের শুঁড় কেটে ফেল। একথা বলে হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং একটি হাতির ওপর আক্রমণ করে এর শুঁড় কেটে ফেলেন। বাকী সৈন্যরাও এটি দেখে তীব্র আক্রমণ হানে এবং বেশ কয়েকটি হাতির পা ও শুঁড় কেটে এর আরোহীদের হত্যা করেন। দৈবক্রমে হযরত আবু উবায়েদ (রা.) একটি হাতির সামনে পড়ে যান। তিনি আক্রমণ করে এর শুঁড় কেটে ফেলেন কিন্তু তিনি সেই হাতির পায়ের নিচে চাপা পড়ে শহীদ হন। হযরত আবু ওবায়েদ (রা.)'র শাহাদতের পর পালা করে সাতজন ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। অষ্টম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুসান্না (রা.), তিনি ইসলামী পতাকা বহন করে পুনরায় জোরালো আক্রমণের সংকল্প করেন, কিন্তু ইসলামী সৈন্যসারি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল আর লোকেরা একের পর এক সাতজন আমীরকে শহীদ হতে দেখে দিগ্বিদিক ছুটতে আরম্ভ করে আর কিছু (সৈন্য) নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত মুসান্না (রা.) এবং তার সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন আর এক পর্যায়ে হযরত মুসান্না (রা.) আহত হন এবং যুদ্ধ করতে করতে ফুরাত নদী পার হয়ে ফিরে আসেন।

এ ঘটনায় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। মুসলমানদের চার হাজার সৈন্য শহীদ হয় আর ইরানীদের ছয় হাজার সৈন্য নিহত হয়। **(হাকীম আহমদ হুসাইন এলাহাবাদী অনুদিত, তারীখে ইবনে খলদূন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০-২৭৩, করাচির দারুল ইশায়াত থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

যাহোক, এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল, ইরানীদের পক্ষ থেকে বারংবার আক্রমণ করা হচ্ছিল তাই তা প্রতিহত করার জন্যই এই যুদ্ধ করার অনুমতি নেয়া হয়েছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত সাহ্‌ল বিন আতীক (রা.)। তার নাম সোহায়েলও বর্ণনা করা হয়। তার মায়ের নাম ছিল জামীলাহ্ বিনতে আলকামাহ্। হযরত সাহ্‌ল বিন আতীক (রা.) সত্তরজন আনসারকে সাথে নিয়ে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭, সাহ্‌ল বিন আতীক (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮ সাহ্‌ল বিন আতীক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত সোহায়েল বিন রাফে' (রা.)। হযরত সোহায়েল (রা.) ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য। যে জমির ওপর মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছে, তা ছিল তার ও তার ভাই হযরত সাহ্‌ল (রা.)'র সম্পত্তি। তার মায়ের নাম ছিল যোগায়বা বিনতে সাহ্‌ল। হযরত সোহায়েল (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি (রা.) হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ (রা.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭২, সোহায়েল বিন রাফে' (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা লিখেছেন তা উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) লিখেন,

"তিনি [অর্থাৎ মহানবী (সা.)] যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি (সা.) যেন তার বাড়িতে অবস্থান করেন। তাঁর (সা.) উট যে গলিপথ দিয়ে অতিক্রম করতো, সেই গলিতে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানাতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটি আমাদের বাড়ি, এই হল আমাদের সম্পত্তি, আর এই হল আমাদের প্রাণ, যা আপনার সেবায় নিবেদিত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখি। আপনি আমাদের বাড়িতে অবস্থান করুন। কেউ কেউ আবেগের বশে এগিয়ে আসতো আর তাঁকে (সা.) নিজের বাড়িতে নেওয়ার জন্য তাঁর উটের লাগাম ধরে ফেলতো। কিন্তু তিনি প্রত্যেককে এই উত্তরই দিতেন, আমার উটকে ছেড়ে দাও, এটি আজ খোদার পক্ষ থেকে আদিষ্ট।", (নিশ্চিত থাকো, একে যেখানে নির্দেশ দেওয়া হবে বা আল্লাহ্ তা'লা যেখানে চাইবেন এটি সেখানেই বসে পড়বে)। "আল্লাহ্ তা'লা যেখানে চাইবেন এটি সেখানেই দাঁড়াবে। অবশেষে মদীনার এক প্রান্তে বনু নাজ্জারের এতীমদের একখণ্ড জমির কাছে গিয়ে উটটি দাঁড়িয়ে পড়ে। তিনি (সা.) বলেন, মনে হয় এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রায়, আমরা যেন এখানে অবস্থান করি। এরপর বলেন, এই জমি কার? তা ছিল কয়েকজন এতীমের জমি। তাদের অভিভাবক এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি অমুক অমুক এতীমের জমি এবং আপনার সেবায় নিবেদিত। তিনি (সা.) বলেন, আমরা কারো সম্পত্তি বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারি না। অবশেষে এর মূল্য নির্ধারিত হয় আর তিনি (সা.)

সেখানে মসজিদ এবং নিজ বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২৮)**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এর বিশদ বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, "মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম কাজ ছিল মসজিদে নববী নির্মাণ করা। যে স্থানে তাঁর (সা.) উট এসে বসেছিল, তা ছিল মদীনার দু'জন মুসলমান বালক সাহ্ল এবং সোহায়েল (রা.)'র সম্পত্তি, যারা হযরত আসাআদ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছিল। এটি একটি পরিত্যক্ত ভূমি ছিল। (অর্থাৎ একেবারে বিরাণ ও অনাবাদি জমি ছিল), "যার একাংশে কয়েকটি খেজুর গাছ ছিল।" দু'একটি গাছ ছিল। "আর অপরাংশে ছিল কিছু পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ।" অর্থাৎ (পোড়ো বাড়ি বা ধ্বংসাবশেষ ছিল)। "মহানবী (সা.) এই স্থানকে মসজিদ এবং নিজের হুজরা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন এবং দশ দিনার ... দিয়ে এই জায়গা ক্রয় করা হয়। এরপর সেই জায়গা সমতল করে এবং গাছপালা কেটে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে যায়।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২৬৯}**

একটি বর্ণনা অনুসারে এই জমির ক্রয়মূল্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পরিশোধ করেছিলেন।

এরপর লিখেন, সেই জায়গাকে সমতল করে এবং গাছপালা কেটে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) স্বয়ং দোয়ার মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যেমনটি কুবার মসজিদের বেলায় হয়েছিল, সাহাবীরাই রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজ করেন আর মহানবী (সা.) নিজেও কখনো কখনো এ কাজে অংশ নিতেন। অনেক সময় ইট বহন করার সময় সাহাবীরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা আনসারী (রা.)'র এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতেন-

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ

অর্থাৎ- এই বোঝা খায়বারের বাণিজ্য-সম্ভারের বোঝা নয় যা পশুর পিঠে বোঝাই হয়ে আসে, বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা তাক্বওয়া এবং পবিত্রতার বোঝা, যা আমরা তোমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় বহন করি। আর কখনো কখনো কাজ করার সময় সাহাবীরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَه، فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থাৎ, হে আমাদের আল্লাহ্! পারলৌকিক প্রতিদানই হল সত্যিকার প্রতিদান। অতএব তুমি আপন অনুগ্রহে আনসার এবং মুহাজিরদের প্রতি স্বীয় কৃপা বর্ষণ কর। সাহাবীরা যখন এই পঙ্‌ক্তি পড়তেন তখন কখনো কখনো মহানবী (সা.)ও তাদের সুরে সুর মেলাতেন। এভাবে এক দীর্ঘ পরিশ্রমের পর মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। মসজিদ ভবনটি প্রস্তর খণ্ড এবং ইট নির্মিত ছিল যা কাঠের খুঁটির মাঝে স্থাপন করা হয়েছিল। সে যুগে এই প্রচলন ছিল যে, মজবুত ঘর বানানোর জন্য কাঠের খুঁটি দাঁড় করিয়ে অর্থাৎ পিলার বা স্তম্ভ বানিয়ে একে মজবুত করার জন্য এর মধ্যে ইট ও মাটির দেওয়াল গাঁথা হতো। এটি ছিল এর কাঠামো। আর ছাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল খেজুর গাছের কাণ্ড ও পাতা। মসজিদের ভেতর ছাদের ভর ধরে রাখার জন্য খেজুর গাছের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল। যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) খুতবা দিতেন, যতদিন সেই মিম্বর বানানোর প্রস্তাব আসে নি ততদিন মহানবী (সা.) এই খুঁটিগুলোর মধ্য হতে একটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

মসজিদের মেঝে ছিল কাঁচা এবং অতি বৃষ্টির সময় যেহেতু ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়তো, তাই তখন মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যেত। অতএব এই সমস্যার কারণে পরবর্তীতে নুড়ি পাথর দিয়ে মেঝে বানিয়ে দেওয়া হয়। ছোট ছোট পাথর সেখানে বসানো হয়। শুরুর দিকে মসজিদ ছিল বাইতুল মোকাদ্দসমুখী, কিন্তু ক্বিবলা পরিবর্তেনের সময় সেই দিক পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। তখন মসজিদের উচ্চতা ছিল দশ ফুট, (অর্থাৎ ছাদের উচ্চতা ছিল দশ ফুট।) দৈর্ঘ ছিল প্রায় ১০৫ ফুট (১০৫ ফুট লম্বা ছিল) আর প্রস্থ ছিল ৯০ ফুট (৯০ ফুট প্রশস্ত ছিল)। কিন্তু পরবর্তিতে এর সম্প্রসারণ করা হয়। ১০৫x৯০ বর্গফুট আয়তনের এই মসজিদে প্রায় পনেরশ' থেকে ষোলশ' মুসল্লির নামাযের সংকুলান হতো।

মসজিদের এক প্রান্তে ছাদ বিশিষ্ট একটি কক্ষ বানানো হয়েছিল যাকে 'সুফ্ফাহ্' বলা হত। এটি সেসব দরিদ্র মুহাজিরের জন্য ছিল যাদের কোন বাড়িঘর ছিল না। তারা এখানেই থাকতেন আর **আসহাবে সুফ্ফাহ্** আখ্যায়িত হতেন। এমন মনে হতো যেন তাদের কাজ ছিল কেবল দিবারাত্র মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে থাকা, ইবাদত করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। তাদের আয় রোজগারের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সা.) স্বয়ং তাদের দেখাশোনা করতেন। কোন স্থান থেকে যখনই তাঁর (সা.) কাছে কোন উপহার ইত্যাদি আসত অথবা ঘরে কিছু থাকলে মহানবী (সা.) তাদের অংশ অবশ্যই পৃথক করে রাখতেন। মহানবী (সা.)ই প্রায়শ তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করতেন। বরং মহানবী (সা.) অনেক সময় নিজে অনাহারে থেকে ঘরে যা কিছু থাকতো তা **আসহাবে সুফফাহ্**-কে পাঠিয়ে দিতেন। আনসারগণও সাধ্যানুসারে তাদের আতিথেয়তায় যত্নবান থাকতেন আর খেজুরগুচ্ছ এনে তাদের জন্য মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা শোচনীয়ই থাকত আর অনেক সময় অনাহারে পর্যন্ত থাকতে হত। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এক পর্যায়ে মদীনার সম্প্রসারণের কারণে তাদের কর্মসংস্থান হয় আর কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় বাইতুল মাল থেকেও কিছুটা সাহায্য দেয়ার মত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অবস্থা অনুকূল হলে তাদের সাহায্য দেয়া আরম্ভ হয়।

মহানবী (সা.)-এর জন্য মসজিদ সংলগ্ন আবাস গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। ঘর আর কী! ১০-১৫ ফুটের ছোট একটি কক্ষ ছিল। এই কক্ষ ও মসজিদের মাঝে একটি দরজা রাখা হয়েছিল যা দিয়ে তিনি নামায ইত্যাদির জন্য মসজিদে আসতেন। তিনি (সা.) যখন আরো বিয়েশাদী করেন তখন এই কক্ষের সাথে সন্নিবেশিত করে আরো কক্ষ নির্মিত হতে থাকে। মসজিদের আশেপাশে অন্য সাহাবীদের বাড়িঘরও নির্মিত হয়।

এ ছিল মসজিদে নববী (সা.) যা মদীনায় নির্মিত হয়। সে যুগে যেহেতু এছাড়া অন্য কোন গণভবন ছিল না যেখানে জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হতো তাই প্রশাসনিক গণভবন হিসেবে এই মসজিদই ব্যবহৃত হতো। এটিই অফিস ছিল, এটিই সরকারের সচিবালয় ছিল, এখানেই মহানবী (সা.)-এর বৈঠক বসত, এখানেই সব পরামর্শ হতো, এখানেই মামলা মোকদ্দমার রায় প্রদান করা হতো, এখান থেকেই নির্দেশাবলী জারি করা হতো, এটিই জাতীয় অতিথিশালা ছিল, অর্থাৎ অতিথিশালা হিসেবেও এই মসজিদই ব্যবহৃত হত এবং জাতীয় সকল কার্যক্রম এ মসজিদেই সমাধা করা হতো। প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দিদের কারাগার হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতো, অর্থাৎ যুদ্ধবন্দিদের এই মসজিদেই রাখা হতো। মুসলমানদের ইবাদত করা ও তাদের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা দেখে অনেক বন্দি মুসলমানও হয়েছে। যাহোক, এ সম্পর্কে একজন প্রাচ্যবিশারদ, যে কিনা ইসলাম এবং

মহানবী (সা.) সম্পর্কে যথেষ্ট বিরোধিতামূলক কলম চালিয়েছে সেই উইলিয়াম মুইরও লিখেছে,

'নির্মাণ সামগ্রীর নিরিখে যদিও এ মসজিদ অত্যন্ত সাদামাটা ও সাধারণ (মসজিদ) ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর এই মসজিদ ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে। খোদা তা'লার রসূল (সা.) ও তাঁর সাথীরা (রা.) তাদের বেশিরভাগ সময় এই মসজিদেই অতিবাহিত করতেন। এখানেই যথারীতি বাজামা'ত ইসলামী নামায আরম্ভ হয়। এখানেই সব মুসলমান জুমুআর দিন খোদার তাজা ওহী শোনার জন্য সশ্রদ্ধ ও ভীত অবস্থায় সমবেত হতো। এখানেই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিজয়ের প্রস্তাবাবলীকে সুদৃঢ় রূপ দিতেন। এটিই সেই ভবন ছিল যেখানে বিজিত ও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর (সা.) সামনে পেশ হতো। এটিই সেই দরবার ছিল যেখান থেকে সেই রাজ ফরমান জারি করা হতো, যা আরবের দূরবর্তী সকল প্রান্তের বিদ্রোহীদের ভয়ে প্রকম্পিত করতো আর অবশেষে এই মসজিদ সংলগ্ন তাঁর স্ত্রী হযরত আয়শা (রা.)-এর কক্ষে মুহাম্মদ (সা.) ইহজগৎ ত্যাগ করেন এবং এখানেই তিনি তাঁর দু'জন খলীফার পাশে সমাহিত হয়েছেন।

এই মসজিদ ও এর পার্শ্ববর্তী কক্ষ মোটামুটি ৭ মাস সময়ের মধ্যে নির্মিত হয় এবং মহানবী (সা.) তাঁর সহধর্মিণী হযরত সওদা (রা.)'র সাথে নতুন ঘরে উঠেন। এছাড়া কয়েকজন মুহাজিরও আনসারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে মসজিদের আশে পাশে বাড়িঘর নির্মাণ করেন। যারা মসজিদের কাছে জমি পান নি তারা দূরে গৃহ নির্মাণ করে। আর কেউ কেউ আনসারদের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্মিত গৃহ পেয়ে যায়।' **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২৬৯-২৭১}**

যাহোক হযরত সোহায়েল (রা,) ও তার ভাই সেই সৌভাগ্যবান ছিলেন, যারা ইসলামের এই মহান কেন্দ্রের জন্য নিজেদের জমি দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাঁর নাম হল, হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)। তিনি অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে অওস। একজন বদরী সাহাবী হযরত আবু যাইয়্যাহ্ নু'মান বিন সাবেত (রা.), তিনি ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই। তাঁর ডাক নাম আবু খায়সামাহ্ এবং আবু আবদুল্লাহ্ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.) এবং হযরত আবু সালমাহ্ বিন আব্দুল আসাদ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, লি-ইবনে সা'দ (রা.) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭, সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯, সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

হযরত সা'দ (রা.) সেই ১২ জন নকীব বা সর্দারের একজন ছিলেন, যাকে মহানবী (সা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মদীনার মুসলমানদের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। ১২ জন প্রধান কীভাবে নিযুক্ত হন, তাদের নাম ও কাজের কিছুটা বিশদ বিবরণ তুলে ধরছি যা সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন।

১৩ নববীর যিলহজ্জ মাসে হজ্জের সময় অওস ও খাযরাজ গোত্রের কয়েকশত' মানুষ মক্কায় আসে। তাদের মাঝে ৭০ ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা হয় ইতোমধ্যেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা তখন মুসলমান হতে চাচ্ছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও তাদের সাথে ছিলেন।

মুসআব (রা.)'র মা জীবিত ছিল আর সে পৌত্তলিকা হলেও তাকে (অর্থাৎ মুসআব (রা.)-কে) ভালোবাসতেন। সে তার আগমনের সংবাদ পেলে তাকে বলে পাঠায়, প্রথমে আমার সাথে দেখা করে যাও, এরপর অন্য কোন স্থানে যেও। মুসআব (রা.) উত্তরে বলেন, এখনো আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি নি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পর আপনার কাছে আসব। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সার্বিক খবরাখবর দেয়ার পর নিজের মায়ের কাছে যান। সে (অর্থাৎ, মা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত ছিলেন, তাকে দেখে অনেক কাঁদেন এবং অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করেন। মুসআব (রা.) বলেন, মা! তোমাকে আমি খুব ভালো একটি কথা বলতে চাই যা তোমার জন্য অত্যন্ত উপকারী আর এতে সব বিবাদের মিমাংসা হয়ে যাবে। সে জিজ্ঞেস করে তা কী? মুসআব (রা.) খুব নরম সুরে বলেন, তাহল প্রতিমা পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে যাও আর মহানবী (সা.) প্রতি ঈমান আনয়ন করো। তিনি ছিলেন কট্টর মুশরিক, শুনতেই হৈচৈ বাধিয়ে দেয় আর বলে, আমি নক্ষত্রের কসম খাচ্ছি, আমি কখনো তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করব না আর তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি ইঙ্গিত করেন তারা যেন মুসআব (রা.)-কে ধরে বন্দি করে রাখে। কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

যাহোক, মহানবী (সা.) মুসআব (রা.)'র মাধ্যমে পূর্বেই আনসারদের আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন আর তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎও করেছিলেন। কিন্তু এ উপলক্ষ্যে যেহেতু নির্জনে একটি সম্মিলিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ পৃথকভাবে দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল তাই হজ্জের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর যিলহজ্জ মাসের মধ্যবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়, যেন তারা সেদিন মাঝ রাতের কাছাকাছি সময়ে সবাই বিগত বছরের সেই উপত্যকায় এসে তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হয়, যাতে নিশ্চিন্তে ও একান্তে কথা বলা যেতে পারে। পাছে শত্রু না দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় তিনি (সা.) আনসারদের তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেন, তারা যেন একসাথে না আসে বরং একজন দু'জন করে আসে এবং নির্ধারিত সময়ে যেন উপত্যকায় পৌঁছে যায়। আর কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাকে যেন না জাগায় এবং কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য যেন অপেক্ষা না করে। অতএব নির্ধারিত দিনে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) একা ঘর থেকে বের হন, যাত্রাপথে তাঁর চাচা আব্বাসকে সাথে নেন যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি, মুশরিক ছিলেন, কিন্তু তাকে ভালোবাসতেন আর হাশেম বংশের নেতা ছিলেন। এরপর তারা উভয়ে সেই উপত্যকায় পৌঁছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আনসাররাও দু'একজন করে উপত্যকায় উপস্থিত হয়। তারা ৭০জন ছিলেন অওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের সদস্য। আব্বাস যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি সর্বপ্রথম তিনি আলোচনা আরম্ভ করে বলেন, হে খাযরাজের সদস্যরা! মুহাম্মদ (সা.) তার বংশের একজন সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন মানুষ। আর সেই বংশ আজ পর্যন্ত তাঁর নিরাপত্তা দিয়ে আসছে এবং প্রতিটি হুমকির মুখে তাঁর নিরাপত্তার জন্য বুক পেতে দিয়েছে। কিন্তু এখন মুহাম্মদ (সা.) স্বদেশ ত্যাগ করে তোমাদের কাছে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। অতএব তোমরা যদি তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার বাসনা রাখ তাহলে তোমাদেরকে সকল অর্থে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। আর সকল শত্রুর মোকবিলায় তাঁর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তোমরা যদি এর জন্য প্রস্তুত থাক তাহলে ভালো নতুবা এখনই পরিষ্কার উত্তর দিয়ে দাও, কেননা পরিষ্কার কথা বলাই উত্তম। বারা বিন মা'রূর (রা.), যিনি আনসার গোত্রের একজন বয়স্ক ও প্রভাবশালী

নেতা ছিলেন, তিনি বলেন, আব্বাস! তোমার কথা শুনলাম কিন্তু আমরা চাই মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র মুখে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আর আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চান তা তিনি নিজেই উল্লেখ করুন। তখন মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন আর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন এবং আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমি নিজের জন্য কেবল এতটুকু চাই, যেভাবে তোমরা আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তা বিধান করে থাক, প্রয়োজনে আমার সাথে একই ব্যবহার করো। তিনি (সা.) বক্তৃতা শেষ করার পর আরবদের রীতি অনুসারে বারা বিন মা'রূর (রা.) মহানবী (সা.)-এর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমরা সেই খোদার কসম খাচ্ছি, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমরা নিজ প্রাণের ন্যায় আপনার নিরাপত্তার বিধান করব। আমরা তরবারির ছায়ায় বড় হয়েছি। তার শেষ না হতেই আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান নামে অপর এক ব্যক্তি যিনি সেখানে বসে ছিলেন (পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন,) তিনি বারা'র কথা থামিয়ে দিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ইয়াসরেব বা মদীনার ইহুদীদের সাথে আমাদের অনেক পুরোনো ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, আপনাকে সঙ্গ দিলে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। পাছে এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তা'লা আপনাকে বিজয় দান করবেন আর আপনি আমাদেরকে ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন, ফলে আমরা এদিক ওদিক দু'টোই হারাবো। (তখন) তিনি (সা.) হেসে বলেন, না না, এমনটি আদৌ হবে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত হবে আর তোমাদের বন্ধু আমার বন্ধু আর তোমাদের শত্রু আমার শত্রু। একথা শুনে আব্বাস বিন উবাদাহ্ আনসারী (রা.) নিজের সাথীদের প্রতি তাকিয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি জান এই অঙ্গীকারের অর্থ কী? এর অর্থ হল, তোমাদেরকে এখন সকল কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গের সাথে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে মহানবী (সা.)-এর বিরোধীতা করবে তার মোকাবিলার জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং সকল ত্যাগ স্বীকারে সম্মত থাকতে হবে। তখন লোকেরা বলে, হ্যাঁ, আমরা জানি, কিন্তু হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? এরপর তারা সবাই মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমরা এ সবকিছু করবো কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো? তিনি (সা,) বলেন, **তোমরা খোদার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর পুরস্কারগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় পুরস্কার**। তখন তারা সবাই বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই ব্যবসায় আমরা একমত। আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত প্রসারিত করেন এবং এই সত্তর জন নিবেদিতপ্রাণ লোকের দলটি একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তির অধীনে তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করেন। এই বয়আতের নাম হল, আকাবার দ্বিতীয় বয়আত।

বয়আত সমাপনান্তে মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, মূসা (আ.) তাঁর জাতির মধ্য থেকে ১২ জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলেন, যারা মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সুরক্ষক ছিলেন। আমিও তোমাদের মধ্য থেকে ১২ জন সর্দার নিযুক্ত করতে চাই, যারা তোমাদের নিগরান ও সুরক্ষক হবে আর তারা আমার জন্য ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের ন্যায় হবে এবং আমার কাছে স্বজাতির জন্য জবাবদিহি করবে। অতএব, তোমরা উপযুক্ত লোকদের নাম আমার কাছে প্রস্তাব কর। নির্দেশ অনুযায়ী ১২ জনের নাম প্রস্তাব করা হলে তিনি (সা.) তাদের অনুমোদন প্রদান করেন। আর তাদেরকে এক একটি গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত করে স্ব-স্ব দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। আবার কোন কোন গোত্রের জন্য তিনি (সা.) দু'জন করে নকীব বা তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করেন। যাহোক, সেই ১২ জন সর্দাদের নাম হল,

আসআদ বিন যুরারাহ্, উসায়েদ বিন হুযায়ের, আবুল হাইসাম মালিক বিন তাইয়্যেহান, সাদ বিন উবাদাহ্, বারা বিন মা'রূর, আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা, ওবাদাহ্ বিন সামেত, সা'দ বিন রবী', রাফে' বিন মালিক, আবদুল্লাহ্ বিন আমর এবং সা'দ বিন খায়সামাহ্ (যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, ইনিও অর্থাৎ সা'দ বিন খায়সামাহ্ সেসব সর্দারের একজন ছিলেন) এবং মুনযের বিন আমর (রা.)। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ২২৭-২৩২}**

মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) কুবায় হযরত কুলসূম বিন হিদম (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। আবার এটিও বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর অবস্থান হযরত কুলসুম বিন হিদম (রা.)'র বাড়িতেই ছিল কিন্তু তিনি (সা.) যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষের মাঝে বসতেন তখন হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র ঘরে বসতেন। **(সীরাতুন্ নবুবিয়্যাহ্, লি-ইবনে কাসীর, পৃঃ ২১৫-২১৬, ফাসলু ফী দুখূলিহি আলাইহিস সালাম..., বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)**

আকাবার প্রথম বয়আতের পর মহানবী (সা.) যখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে মদীনার লোকদের তরবীয়ত বা শিক্ষাদিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এর কিছুদিন পর তিনি তাঁর (সা.) কাছে জুমুআর নামাযের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দেন আর জুমুআ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। বস্তুত এই নির্দেশনার অধীনে মদীনায় প্রথম যে জুমুআর নামায আদায় করা হয় তা হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে পড়া হয়। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৮, মুসআবুল খায়র, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

এটি আত্ তাবাকাতুল কুবরার উদ্ধৃতি। কুবায় হযরত সাদ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র একটি কূপ ছিল যেটিকে **আলাগর্স** বলা হত। মহানবী (সা.) এই কূপ থেকে পানি পান করতেন। তিনি (সা.) এই কূপ সম্পর্কে বলেন, এটি জান্নাতের কূপগুলোর একটি আর এর পানি সর্বোত্তম। অর্থাৎ এর পানি ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট ও সুশীতল। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর এই কূপের পানি দ্বারাই তাঁকে গোসল করানো হয়। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর গারস কূপ থেকে ৭ মশক পানি এনে সেই পানি দ্বারা আমাকে গোসল করাবে**। আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.)-কে তিনবার গোসল করানো হয়েছে। পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই তাঁকে (সা.) গোসল দেয়া হয়েছে**। অর্থাৎ কামিস খোলা হয় নি। হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত ফযল (রা.) তাঁকে (সা.) গোসল করিয়েছেন। অপর এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.), হযরত শুকরান (রা.) এবং হযরত অওস বিন খওলী (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর গোসলদাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{আত্ তাব্কাতুল কুবরা, লি-ইবনে সা'দ (রা.), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪, যিকরে গোসলি রসূলুল্লাহ্ (সা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জায়া ফী গোসলিন্ নবী (সা.), হাদীস নংঃ ১৪৬৮}, (সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রিশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯, আল্ বাবুল আউয়াল, ফীমা ইয়াসতা'জাবু লাহুল মাউ..., বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)**

কুরাইশদের নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরতকারী অনেক মুসলমানের প্রথম ঠিকানা হতো হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়ি। অর্থাৎ যারাই হিজরত করে

আসতেন তারা হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করতেন। এক্ষেত্রে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন, হযরত হামযা (রা.), হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.), হযরত আবু কাবশাহ্ (রা.) {যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন}, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) প্রমুখ। তারা হিজরত করে এসে হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.)'র বাড়িতে উঠেন। **{আত্ তাআকাতুল কুবরা, লে-ইবনে সা'দ (রা.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬, ৩২, ৩৬ ও ১১২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

সুলায়মান বিন আব্বান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্য যাত্রা তখন হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.) ও তার পিতা উভয়েই তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার সংকল্প করেন আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে তা নিবেদন করা হয় যে, পিতা-পুত্র উভয়েই ঘর থেকে বের হচ্ছেন। তখন তিনি (সা.) নির্দেশ দেন, উভয়ের মধ্য থেকে কেবল একজন যেতে পারবে। তারা নিজেদের মধ্যে লটারী করে নিক। হযরত খায়সামাহ্ (রা.) তার পুত্র সা'দকে বলেন, আমাদের মধ্যে কেবল একজনই যেতে পারবে, তাই তুমি মহিলাদের দেখাশোনার জন্য তাদের কাছে থেকে যাও। হযরত সাদ (রা.) বলেন, জান্নাত ছাড়া যদি অন্য কোন বিষয় হতো তাহলে আমি আপনাকে প্রাধান্য দিতাম কিন্তু আমি নিজেই শাহাদতের অভিলাসী। তাই তারা টস করেন আর এতে হযরত সাদ (রা.)'র নাম আসে। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। **{আল্ মুসতাদরেক, আলাস্ সহীহাঈন লিল হাকাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৯, ওয়ামান মানাকেব সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.), হাদীস নংঃ ৪৮৬৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

তাকে আমর বিন আবদে উদ্দ শহীদ করে। অপর এক উক্তি অনুসারে তাঁকে শহীদ করেছে তুআয়মা বিন আদী। তুআয়মাকে হযরত হামযা (রা.) বদরের যুদ্ধে আর আমর বিন আবদে উদ্দকে হযরত আলী (রা.) পরিখার যুদ্ধে হত্যা করেন।

{উসদুল গাবাহ্, ফি মা'রিফাতুস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯, সা'দ বিন খায়সামাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}

হযরত আলী (রা.) বলেন, (একটি বর্ণনায় রয়েছে,) বদরের দিন যখন সূর্য উদিত হয় আর মুসলমান ও কাফিরদের সারি পরস্পর মুখোমুখি হয় অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন আমি একজনের পশ্চাদ্ধাবন করি, সে সময় আমি দেখি; একটি বালির টিলার ওপরে হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.) এক মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করছেন, একপর্যায়ে সেই মুশরিক হযরত সা'দ (রা.)-কে শহীদ করে। সেই মুশরিক লোহার বর্ম পরিহিত– অশ্বারোহী ছিল। এরপর সে ঘোড়া থেকে নীচে নেমে আসে। সে আমাকে চিনতে পারলেও আমি তাকে চিনতে পারি নি। সে আমাকে লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ দেয়। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। সে এগিয়ে এসে আমার ওপর আক্রমন করতে উদ্যত হলে আমি পিছু হটে নীচে নেমে যাই যেন সে ওপর থেকে আমার কাছে এসে যায় আর বেশি উঁচু স্থানে যেন না থাকে। (অর্থাৎ) রণ কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি এটি চান, শত্রু যেন নীচে ও কাছে এসে যায়, কেননা সে উঁচু স্থান হতে আমার ওপর তরবারির আঘাত হানবে তা আমার মনঃপূত হচ্ছিল না। আমি যখন এভাবে পিছু হটছিলাম তখন সে বলে, হে আবু তালেবের সন্তান! তুমি কি ভয়ে পালাচ্ছ? তখন আমি তাকে বলি,

قَرِيْبٌ مَفَرُّ ابنِ الشَّرْعَاء অর্থাৎ ইশতেরার পুত্রের পালানো অসম্ভব। (ইশতেরা বাক্যটি) আরবে একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাসে লেখা আছে, এক ডাকাত ছিল যে মানুষের সম্পদ লুটপাট করার জন্য আসত, কিন্তু মানুষ তার ওপর আক্রমন করলে সে পালিয়ে যেত।

কিন্তু সে সাময়িকভাবে পালালেও সুযোগ বুঝে অচিরেই আক্রমন করে বসত। অতএব এটি প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছিল। অর্থাৎ কৌশলের অংশ হিসেবে পিছু হট এরপর আক্রমন কর। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার পা যখন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় আর সেও আমার কাছে এসে যায়, তখন সে নিজ তরবারি দ্বারা আমার ওপর আক্রমন করে, যা আমি আমার ঢাল দ্বারা প্রতিহত করি এবং তার কাধে এত জোরে আঘাত করি যে তরবারি তার বর্মচ্ছেদ করে বেরিয়ে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার তরবারি তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। এমন সময় আমি আমার পেছন হতে তরবারি ঝলকানি অনুভব করি। তিনি (রা.) বলেন, দ্বিতীয় আঘাত হানতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমি পেছন হতে তরবারির ঔজ্জ্বল্য অনুভব করি। আমি ত্বড়িৎ আমার মাথা নত করি এই আশঙ্কায় যে, পেছন হতে কোন তরবারির আঘাত আসছে। আর সেই তরবারি এত জোরে সেই শত্রুর ওপর আঘাত হানে যে, তার মস্তক শিরস্ত্রাণসহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি পেছন ফিরে দেখি– তিনি ছিলেন হযরত হামযা (রা.)। তিনি তাকে বলছিলেন, (পারলে) আমার আক্রমণ প্রতিহত কর; আমি আব্দুল মুত্তলিবের পুত্র। **(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদী, পৃঃ ৯২-৯৩, গযওয়াহ্ বদর, আলেমুল কিতাব থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত), (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩১, লাহোরের আলী আসেফ প্রিন্টার থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)**

কে কার হাতে নিহত হয়েছে এ সংক্রান্ত সন্দেহের অবসান এই বর্ণনার মাধ্যমে হয়। মনে হয়, তুআয়মা বিন আদী হযরত সাদ (রা.)-কে শহীদ করেছিল আর এরপর সেও সেখানেই নিহত হয়। এক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.)-এর কাছে বদরের যুদ্ধে দু'টো ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) আর অপরটিতে হযরত সা'দ বিন খায়সামাহ্ (রা.) আরোহিত ছিলেন। হযরত যুবায়ের বিন আল্ আওয়াম (রা.) এবং হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)ও পালা করে এতে আরোহণ করতেন। **(দালায়েলুন্ নবুওয়্যাহ্ লিল বায়হাকী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০, সিয়াক কিস্সা বদর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত)**

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কয়টি ঘোড়া ছিল? সে সম্পর্কে ইতিহাসে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) মনে করেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে ৭০টি উট ও দু'টো ঘোড়া ছিল। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৩৫৩}**

কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে ঘোড়ার সংখ্যা ৩টি এবং ৫টি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

(শরাহ্ যুরকানী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬০, বাব গযওয়ায়ে বদরুল্ কুবরা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত), {আস্ সীরাতুল হালবীয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫, বাব যিকরে মাগাযী (সা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

যাহোক, সাজসরঞ্জাম, ঘোড়া এবং উটের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, কাফিরদের সাজসরঞ্জাম ও ঘোড়ার সংখ্যার সাথে এর কোন তুলনাই চলে না। কিন্তু মুসলমানদের ওপর যখন আক্রমণ করা হয় এবং যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় আর অবিশ্বাসীরা ইসলামকে নির্মূল করার অলিক ধারণা নিয়ে আসে, তখন মু'মিনরা নিজেদের সরঞ্জামের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, ঘোড়ার প্রতি তাকান নি, বরং খোদার খাতিরে এক ত্যাগের স্পৃহা ছিল, যেমনটি কিনা তাদের উত্তর থেকেও স্পষ্ট হয়, এখানে অন্য কোন পার্থিব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন নয়, এখানে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানীর প্রশ্ন। তাই পুত্র তার পিতাকে বলেছিলেন, এক্ষেত্রে আমি আপনাকে প্রাধান্য দিতে পারি না। যাহোক, এক প্রকার ব্যাকুলতা ছিল, যা খোদা তা'লা

গ্রহণ করেছেন আর বিজয়ও দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিক্ষণে এই সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নীত করতে থাকুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃঃ ৫-৯)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)